International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 719-723
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss. v11.i4.100

যোগ দর্শন ও কর্মযোগ: মুক্তি ও মানবকল্যাণের দার্শনিক অন্বেষণ

নিবেদিতা দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, সিঙ্গুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 19.07.2025; Accepted: 21.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the vast tradition of Sanātana Indian philosophy, the Śrīmad Bhagavad Gītā occupies an unparalleled position as a repository of timeless wisdom. Composed as a dialogue between Śrī Kṛṣṇa and Arjuna on the battlefield of Kurukṣetra, the Gītā delineates a comprehensive vision of life that integrates knowledge (jñāna), action (karma), and devotion (bhakti). Its philosophical core emphasizes the disciplined practice of karma-yoga, the performance of one's svadharma without attachment to the fruits of action, and the cultivation of equanimity as the means to transcend the destructive impulses of desire, anger, and greed, which are identified as the root causes of human bondage.

Parallel to this vision stands Patañjali's Yoga Sūtras, another foundational text of Indian thought, which charts a systematic path to liberation (mokṣa) through the eightfold discipline of aṣṭāṅga-yoga. Whereas Patañjali places primary emphasis on self-purification, concentration, and mastery over the modifications of the mind (citta-vṛtti-nirodha), the Gītā focuses on selfless action and moral responsibility as instruments of inner transformation and social harmony.

This study examines the complementary nature of these two traditions, exploring their shared emphasis on the integration of personal liberation and collective welfare. Both texts transcend the boundaries of caste, creed, and sect to propose a universal vision of human perfection that harmonizes the ethical, spiritual, and social dimensions of life.

In the contemporary context, the synthesis of Patañjali's Yoga and the Gītā's karma-yoga offers a profound ethical and spiritual framework capable of addressing the alienation, moral crisis, and fragmentation of modern society. Through this comparative philosophical inquiry, the paper highlights how these classical Indian systems remain enduringly relevant as pathways to individual emancipation and the holistic upliftment of humanity.

Key Words: Bhagavad Gītā, Karma-Yoga, Yoga Philosophy, Moksha, Social Welfare

আলোচনা:

যোগ একটি পরিষ্কার, বৈষম্যহীন পদ্ধতি। এখানে মানুষের কোন ভেদ শিকার করা হয় না। পন্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক, যোগী-ভোগী, নর-নারী সর্বস্তরের মানুষের জন্য যোগ সাধনা সমানভাবে প্রযোজ্য। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় যোগের বিভিন্ন প্রকার, পদ্ধতি, উপকারিতা, প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গীতায় এক সার্বজনীন সমদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিন:।। (শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৫/১৮)

সপ্তশতী সূত্র সমন্বিত গীতা মোট ১৮ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যার তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন কেউই ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কারণ প্রকৃতির বশবর্তী হয়েই মানুষ কর্ম করতে বাধ্য। হাত-পা সঞ্চালন না করেও শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি করাও স্বাভাবিক কর্ম। কোন কিছুর স্মরণ করা, চিন্তা করা ইত্যাদিও মানসিক কর্ম। কাজেই গীতায় বলা হয় কেউ যদি বলে সে সর্বপ্রকার কর্ম থেকে বিরত হয়েছেন তাহলে সে মিথ্যাচারী (শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, ৩/৬)। মানুষ মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ- প্রকৃতির এই তিন গুণ দ্বারা উৎপন্ন। প্রকৃতির এই গুণত্রয় দ্বারাই রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি, যার থেকে আসে কর্ম প্রেরণা। ফলে মানুষ মাত্রই কর্ম করতে বাধ্য। যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সংযত করে, সকল কিছুতে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্তব্যবোধে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই কর্মযোগী। এখানে কর্ম বলতে নিষ্কাম কর্মকে বোঝানো হয়েছে। গীতায় কখনোই কর্ম থেকে বিরত থাকাকে শ্রেষ্ট বলা হয়নি। কর্মশূন্যতা অপেক্ষা নিয়ত কর্ম করা শ্রেয় বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়ত কর্ম বলতে বোঝায় শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম, স্বধর্ম, অর্থাৎ ইন্টেরিয়র সফল সংযত করে যে কাজ করা যায় তাই নিয়ত কর্ম। যজ্ঞার্থ ব্যতীত অন্যান্য কর্ম মানুষের জন্য বন্ধনের কারণ হয়। তাই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাই কর্তব্য।

কর্মযোগ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

> ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
> নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৩/৩০)

অর্থাৎ কর্তা হলেন ঈশ্বর, যাবতীয় কর্মফল তাতে সমর্পণ করে কামনা-বাসনা শূন্য হয়ে ভৃত্যবৎ কর্ম করাই কর্মযোগ। গীতায় এই কর্মযোগের তিনটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে - ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন (নিরাশীঃ) অর্থাৎ কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করে যেতে হবে, ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করা হলো সকাম কর্ম, যা মানুষের বন্ধনের কারণ হয়।

কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ (আধ্যাত্মচেতসা, নির্মমঃ) অর্থাৎ 'আমি'ই কর্তা, আমার দ্বারাই কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে এই রূপ অহংকার বোধ পরিত্যাজ্য। এখানে প্রশ্ন ওঠে তাহলে কর্মের কর্তা কে? উত্তরে বলা যায়, ত্রিগুনাত্মক প্রকৃতিই যাবতীয় কর্মের কর্তা। পুরুষ তার থেকে স্বতন্ত্র। যিনি যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী তিনি জানেন পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্তা। মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে জীব নিজেকে অর্থাৎ আত্মা বা পুরুষকে কর্তা বলে মনে করে।

সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ (ময়ি) অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম ঈশ্বরের সমর্পণ করে তার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম করছি এই বিবেক বুদ্ধি থেকে আমাদের কর্ম করে যেতে হবে।

যে মানুষগণ শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে এই মতে কর্ম অনুষ্ঠান করেন তারাই কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়। আর যারা অসূয়াপরবশ হয়ে এই মত অনুষ্ঠান করেনা তারা সর্বজ্ঞানবিমূঢ় ও বিনষ্ট(নষ্টান্) হয়। অতএব কর্মযোগী আসক্তি শূন্য হয়ে কর্ম করবে। আত্মারাম অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল আত্মাতেই প্রীত হন, আত্মাতেই তৃপ্ত, সন্তুষ্ট থাকেন। তার নিজের কোন কর্তব্যকর্ম বা কর্তৃত্বাভিমান নেই। তার কোন কর্ম করার প্রয়োজন নেই আবার কোন কর্ম থেকে বিরত থাকারও প্রয়োজন নেই। কর্ম করা বা না করা উভয়ই তার কাছে সমান। সর্বভূতের মধ্যে কারো আশ্রয় তার প্রয়োজন নেই। সে সিদ্ধ কাম। এইভাবে আসক্তি শূন্য হয়ে সর্বদা কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করলেই পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

> তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার।
> অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৩/১৯)

অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষই হল মুক্তি বা মোক্ষ। যোগ দর্শন মতে, এই মুক্তি লাভের জন্য মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বা বিশেষ কোনো জাতি বা বর্ণের সদস্য হওয়ারও প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তিই মোক্ষ লাভ করতে পারে। শুদ্ধচিত্ত হয়ে যাবতীয় বৃত্তিকে সংযত করতে পারলেই দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। পতঞ্জলির যোগসূত্রে সমাধিপাদে বলা হয় "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ:।। (যোগসূত্র, ১/২)।।" অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। তাঁদের মতে, জগতের দুটি প্রাথমিক উপাদান হল পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি জড়, ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির প্রথম তিনটি পরিণাম হল অহংকার, বুদ্ধি, মন। এই তিনটিকে একসাথে বলা হয় চিত্ত। চিত্তের বিষয় আকার ধারণ বা বৃত্তিই চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন বাহ্যবস্তু যেমন ঘট ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয় চিত্তের তখন ঘটাকার বৃত্তি বা ঘট জ্ঞান হয়। চিত্তে প্রতিফলিত আত্মা অবিদ্যাবসত নিজেকে ওই বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা, কর্তা,

ভোক্তা বলে মনে করে। এই অবস্থাই হচ্ছে আত্মার বদ্ধ অবস্থা। অভ্যাস ও বৈরাগ্য বা ত্যাগের দ্বারা এই চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই চিত্ত শুদ্ধ হবে ও আত্মা মুক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থান করবে।

যোগ দর্শন মতে, 'অষ্টাঙ্গিক যোগ'এর সাহায্যে এই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করা সম্ভব। এই আটটি যোগ হল, "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি।। (যোগসূত্র,২/২৯)।।" অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগাঙ্গের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নাশ করে আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভব। চিত্তবৃত্তির নাশ হলে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে, মুক্তি লাভ করে, সেখানে আর কোন ক্লেশ থাকেনা। যোগ দর্শনে পাঁচ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করা হয়েছে, যথা – (১) অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অনিত্যকে নিত্য বলে জানা বা দুঃখকে সুখ রূপে জানা, অনাতত্মাকে আত্মারূপে জানাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল। (২) অস্মিতা বা অহং-অভিমান। অবিদ্যাবশত আত্মা (পুরুষ) ও চিত্তের (প্রকৃতি) অভিন্নতা বোধ থেকে এই অহং-অভিমান উৎপন্ন হয়। এর ফলে চিৎস্বরূপ আত্মায় জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্বভাব দেখা দেয়। (৩) রাগ বা আসক্তি অর্থাৎ সুখ জনক বস্তুর প্রতি আসক্তি বা তৃষ্ণা। (৪) দ্বেষ হলো দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং (৫) অভিনিবেশ হল মরণত্রাস বা মৃত্যুভয়। এই পঞ্চ ক্লেশ দ্বারা ধর্ম-বর্ণ জাত-পাত দুর্বল-সবল নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি ক্লিষ্ট হয় এবং অষ্টাঙ্গিক যোগের দ্বারা এর থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। মুক্তি লাভে ইচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তি এই আট প্রকার যোগের দ্বারা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে সক্ষম।

আত্মার পারমার্থিক মুক্তি কেবল নয়, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও এর অবদান অনস্বীকার্য। যোগ অভ্যাস মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা সকল ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১. সামাজিক উন্নতিতে যোগের ভূমিকা:

মানুষের সামাজিক উন্নতিতে যম ও নিয়ম এর অনুশীলন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি সাধনাকে বলা হয় যম। অহিংসা বলতে বোঝায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা অপরকে আঘাত না করা। অহিংসার এই নেতিবাচক সাধন ছাড়াও একটি ইতিবাচক দিকও আছে। তা হল মৈত্রী, প্রেম-ভালোবাসা। অর্থাৎ সকল প্রকার হিংসা ত্যাগ করে সকলকে ভালোবাসাই অহিংসা। সত্য বলতে বুঝায় যথাযথ কথন ও চিন্তন। মুক্তি লাভে উৎসাহী ব্যক্তিকে অসত্য ভাষণ, অপ্রিয় ভাষণ ও অতি ভাষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। সত্য অপ্রিয় হলে মৌনতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। অস্তেয় বলতে বোঝায় অচৌর্য বা পরদ্রব্য অগ্রহণ। অর্থাৎ সে অপর ব্যক্তির দ্রব্য যেমন গ্রহণ করবে না, তেমনি সেসব দ্রব্যের প্রতি কোন লোভও থাকবে না। ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় সকল ইন্দ্রিয় তথা জননেন্দ্রিয়ের সংযম, মিতাহার ও মিতনিদ্রা অভ্যাস এবং সর্বপ্রকার কাম চিন্তা বর্জন। অপরিগ্রহ বলতে বোঝায়, প্রান ধরনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান গ্রহণ না করা। এই পাঁচ প্রকার যম সাধনা ব্যতীত চিত্তের মলিনতা দূর হবে না।

'নিয়ম' হল সদাচার অনুশীলন। "শৌচসন্তোষতপ:স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়ম:।। (যোগসূত্র,২/৩২)।।" শৌচ, সন্তোষ, তপ:, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটি সাধন হচ্ছে নিয়ম। শৌচ বা শুচিতা দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তরীন। শরীর তথা গৃহ পরিষ্কার রাখা, সাত্ত্বিক আহার করা ইত্যাদি বাহ্যশুচিতা। আর কুচিন্তা ও অহংকার, অভিমান ইত্যাদি ত্যাগ করে শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম, সুচিন্তা অনুশীলনই অআভ্যন্তরীণ শৌচ। সন্তোষ হল যা পায়নি তার জন্য খেদ না করে যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। সন্তোষের দাঁড়াই চিত্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংকল্প সাধনের জন্য কষ্টসহনের অভ্যাসই তপঃ বা তপস্যা। তপ: দ্বারা চিত্তে স্থৈর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বধ্যায় হল মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-প্রণিধান হলো ঈশ্বরের নিরন্তর চিন্তা বা ধ্যান। পতঞ্জলি যোগ-সাধনায় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও ঈশ্বরের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

যম ও নিয়মের অনুশীলনের ফলে আত্মশক্তি তৈরি হয়, যার ফলে সমাজ জীবনে সম্প্রীতির পাশাপাশি সামাজিক স্তরে উন্নতির অনুভূতি প্রবল হয়। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ এর দ্বারা মনের মলীনতা দূর হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও অভ্যন্তরীণ মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজের বিভিন্ন নঞর্থক দিকের সাথে মোকাবিলা করার শক্তি জাগ্রত হয়। আত্মবলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। যার জোরে সমাজে সাম্য অবস্থা ফিরতে শুরু করবে। সকল মানুষই সমান এই সত্য উপলব্ধ হতে থাকে। সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহের অনুশীলনের ফলে সামাজিক বাধ্যবাধকতা উপলব্ধি করবে। এই বোধের ফলে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, ভেদাভেদ, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে। ক্রমে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কেউ আর পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে সমাজচ্যুত হবে না। সকলের মধ্যে

এক প্রেম বা ভালোবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে। গীতায় আমরা যেই সার্বজনীনতার কথা পাই এখানেও তারই পুনরুক্তি লক্ষ্য করা যায়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অগ্রগতির ভিত্তি হতে শুরু করবে এই একত্ববোধ। বর্তমান সময়েও এই সার্বজনীনতা গভীরভাবে অনুপ্রেরণা জাগায় আমাদের সকলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। এই যোগভ্যাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে জাতি বর্ণ বা শ্রেণী সংঘাত বন্ধ করা সম্ভব হবে। কাজেই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ-এ যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছিল তা আজকে দৈনন্দিন জীবনেও অপরিহার্য। সকল হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র হাতিয়াড়। তাই সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনেও আমরা এই কর্মযোগের উল্লেখ পেয়ে থাকি বিভিন্ন মনীষীর দর্শনে। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রমূখ অনেক দার্শনিকই বারংবার কর্মের মধ্যেই মুক্তির কথা তুলে ধরেছেন। যে কর্ম নিষ্কাম কর্ম। যা নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ - অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য একান্তভাবে পালনীয়।

২. ধর্মীয় উন্নতিতে যোগের ভূমিকা:

পৃথিবীতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন। কিছু মানুষ এই ধর্মকে হাতিয়ার করেই দীর্ঘদিন অপর মানুষের উপর শোষণ, অত্যাচার চালাচ্ছে। পাপ, পুণ্য, পরজন্ম, স্বর্গ-নরকের ধারণা প্রচার করে তাদের পদদলিত করে রেখেছে। মনুবাদের প্রভাবে একশ্রেণীর মানুষের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার, বেদ পাঠের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যোগ সাধনায় এরকম কোন ভেদাভেদ বা উচ্চ নিচ কোন ভেদ নেই। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী- পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শৌচ, তপঃ, স্বাধ্যায়ের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। যোগে যে ঈশ্বর প্রনিধানের কথা বলা হয়েছে সেই ঈশ্বরের জন্য কোন মন্দির বা পিঠস্থানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ঈশ্বর হলেন আত্মা বা পুরুষ। যার উপলব্ধি অষ্টাঙ্গিক যোগের সাহায্যে নিজের মধ্যেই করা সম্ভব। এইভাবে 'নিয়মে'র অনুশীলন করলে সকলের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হবে, আবার কাউকে বঞ্চনার শিকারও হতে হবে না।

৩. দলিতদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যোগের ভূমিকা:

ভক্তি, অন্তর্নিহিত শক্তি ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যোগের জ্ঞান অর্জন করে তা সকলের মধ্যে প্রচার করাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করবে। এছাড়াও বিভিন্ন সংঘের সভ্য হয়ে তারা সাধারন মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারবে। তবে সমাজে সকল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ও উন্নত মানসিকতার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য। বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যেন কেউ কোন বাঁধার সম্মুখীন না হয় সেই দিকটিও খেয়াল রাখতে হবে। অষ্টাঙ্গিক যোগে যে আসন ও প্রাণায়াম এর কথা বলা হয় তা সঠিকভাবে চর্চার দ্বারা সকলে যোগব্যায়াম রপ্ত করতে পারবে। পরবর্তীকালে পেশা হিসাবে যোগব্যায়াম শেখানোকে গ্রহণ করলে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠবে। বর্তমান সমাজে যোগব্যায়াম ও প্রাণায়ামের কদর সর্বদেশে, সর্বক্ষেত্রে। আবার এই যোগব্যায়াম চর্চার ফলে তারা হয়ে উঠবে নিরোগ সুঠাম শরীরের অধিকারী। ফলে যে কোন পেশায় তারা খুব সহজে সফলতা পেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাতেও আমরা পারি, যে সুঠাম শরীর ছাড়া সুস্থ মনে মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। রোগে জর্জরিত মানুষের পক্ষে উচ্চপর্যায়ের চিন্তাভাবনায় বাধা আসতে পারে। কাজেই আসন এর অবদান এই ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

আবার যারা অর্থনৈতিক উন্নতির কথা না ভেবে কেবল মোক্ষ বা মুক্তি লাভে উৎসাহী হবে, তাদের জন্যেও আসন ও প্রাণায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি যোগাঙ্গ। আসন বলতে বোঝায় "স্থিরসুখমাসনম্"। অর্থাৎ নিশ্চল ও সুখজনক উপবেশনই আসন। যেমন পদ্মাসন, বীরাসন, শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন আসন আবশ্যক, তেমনি মনকে সুস্থ রাখার জন্যও নিরোগ ও স্বাস্থ্যবান শরীর আবশ্যক। সুস্থ দেহ-মন ছাড়া চিত্ত সংযম সম্ভব নয়। আর 'প্রাণায়াম' বলতে বোঝায়, "শ্বাসপ্রশ্বাসয়ঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম:।" অর্থাৎ বায়ুর নিঃশ্বাসরূপ অভ্যন্তরীণ গতি ও প্রশ্বাস রূপ বহিরগতির বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের ফলে চিত্ত স্থির হয় এবং কোন বিষয়ে চিত্তনিবেশ সম্ভব হয়। চিত্ত স্থির ও কোন বিষয়ে নিবেশিত না করতে পারলে তার পক্ষে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। পরবর্তী যোগাঙ্গ 'প্রত্যাহারে'ও একই কথা বলা হয়। বাহ্যবস্তু থেকে ইন্দ্রিয় কে বিযুক্ত করে অন্তর্মুখী করাই প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় যত বেশি বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হবে চিত্ত ততই চঞ্চল হবে। ফলে ইন্দ্রিয়কে বাহ্য বিষয় থেকে বিযুক্ত করে অন্তর্মুখী করতে হবে, তবেই চিত্ত বিষয়াসক্তি মুক্ত হবে। এই অবস্থাতেই ধ্যেয়বস্তুতে মনোনিবেশ সম্ভব, যা মোক্ষ লাভে সাহায্য করবে।

অতএব ব্যবহারিক অথবা পারমার্থিক যে অর্থেই উন্নতি শব্দটি গ্রহণ করা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যোগ নির্দেশিত পথ অবলম্বন করলে একদিকে যেমন সকলের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, ধর্মীয় সন্তুষ্টি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সম্ভব; অপরদিকে অষ্টাঙ্গিক যোগের সাহায্যে তাদের এই ব্যবহারিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভও সম্ভব। গীতার যোগাভ্যাস বা পতঞ্জলির উল্লেখিত যোগের সাহায্যে নারী-পুরুষ, উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র, দুর্বল-সবল সকল ধর্ম, জাতি, বর্ণের মানুষের দৈহিক ও মানসিক সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সম্ভব। এই যোগের অপরিসীম গুরুত্বের জন্যই সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারায় যোগ সাধনার উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপিত হয়। তাঁর দর্শনেও মোক্ষ বা মুক্তির উপায় হিসাবে বিভিন্ন ধরনের যোগের উল্লেখ করা হয়েছে। গীতাক্ত বিভিন্ন যোগ সাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি চার প্রকার যোগের উল্লেখ করেছেন - জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ। এখানেও কর্মযোগ বলতে তিনি নিষ্কাম কর্মকেই বুঝিয়েছেন। তার মতেও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে, কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরে কর্ম করলেই মুক্তি লাভ সম্ভব। শ্রী অরবিন্দের লেখাতেও আমরা যোগের উল্লেখ পেয়ে থাকি। তাঁর মতেও পূর্ণযোগ বা অখন্ড যোগের মধ্যে দিয়েই মুক্তিলাভ সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনিও এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা নামক প্রবন্ধে। কাজের উপরে উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কেবল আধ্যাত্মিক দিক থেকে নয় বরং ব্যবহারিক দিক থেকেও যোগ সাধনা মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বহু যুগ ধরে আলোচিত হলেও এই কর্মযোগের ধারণা আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। কেবল কর্মযোগ নয় এই কর্মের ওপর ভিত্তি করেই ধর্ম ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে গীতায় এবং পরবর্তীকালেও এই ধারা বজায় রয়েছে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলোচনায়, এমনকি সমসাময়িক যুগেও বহু মনীষী এই আলোচনায় নিজেদের নিবৃত করেছেন। যা এক উন্নত মানব সমাজ গড়ে তোলার পাথেয় হয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Bhagavad Gītā. (2020). *The Bhagavad Gītā* (S. Radhakrishnan, Trans.). Harper Collins Publishers, India. (Original work composed ca. 2nd century BCE)
2. Patañjali. (2018). *The Yoga Sūtras of Patañjali* (S. Prabhavananda & C. Isherwood, Trans.). VedantaPress. (Original work composed ca. 3rd century BCE)
3. Ghosh, J. C. (2018). *Shri Geeta* (শ্রী গীতা), Presidency Library
4. Vivekananda, S. (2022). *Patanjal Yogsutra* (পাতঞ্জল যোগসূত্র), Saraswat Prakashan
5. Chatterjee, S., & Datta, D. M. (1984). *An Introduction to Indian Philosophy*. University of Calcutta.
6. Radhakrishnan, S. (1999). *Indian Philosophy* (Vols. 1–2). Oxford University Press.
7. Vivekananda, S. (2015). *Karma Yoga*. Advaita Ashrama.
8. Bhattacharya, N. (2015). *Darśanera Itihās o Sāra* [দর্শনের ইতিহাস ও সার]. Kolkata: Progressive Publishers.
9. Bandopadhyay, H. (2014). *Bhāratīya Darśan: Udbhab o Bikash* [ভারতীয় দর্শন: উৎপত্তি ও বিকাশ]. Kolkata: Dey's Publishing.
10. Mukhopadhyay, P. (2009). *Bhāratīya Darśaner Dhārā* [ভারতীয় দর্শনের ধারা]. Kolkata: Mitra & Ghosh.
11. Chakraborty, A. (2012). *Śrīmadbhagavadgītā o Jībanadarśan* [শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও জীবনদর্শন]. Kolkata: Ananda Publishers.